



**Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)**

**A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture**

Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 670 - 680

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: [editor@tirj.org.in](mailto:editor@tirj.org.in)

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

## শব্দব্রহ্মের সঙ্গে পাঁচ দশকে তপন বন্দ্যোপাধ্যায় : টলস্টয় ও বিশ্বসাহিত্যের অনুষ্ঠে তাঁর কথাসাহিত্য

টুম্পা দে

স্বাধীন গবেষক

Email ID: [tumpadeydas1986@gmail.com](mailto:tumpadeydas1986@gmail.com)

 0009-0004-1613-3067

**Received Date** 15. 06. 2026

**Selection Date** 15. 07. 2026

### **Keyword**

Tapan  
Bandyopadhyay,  
Leo Tolstoy, V.S.  
Naipaul, Adriaan van  
Dis,  
Partition Trauma,  
Sauren  
Bandyopadhyay,  
Feminist Critique,  
World Literature,  
Comparative  
Literature,  
Post-colonial Identity  
& Rootlessness,  
Contemporary Bengali  
Fiction,  
Existential Crisis  
caused by the Bengal  
Partition.

### **Abstract**

This research paper establishes the philosophical concept of Indian 'Shabdabrahma' within the five decade long literary journey of the eminent contemporary writer Tapan Bandyopadhyay, primarily through an exclusive personal interview with the author. The study illuminates the multifaceted creative spectrum of his works, spanning from diverse thematic and historical novels to children's literature, various prose forms, and the extensive realm of his poetry.

The research provides a comparative dissection of his fictional evolution over fifty years, evaluated against the benchmarks of classical world literature. Central to this inquiry is the evolution of the author's post colonial identity. Based on primary data from the interview, the article investigates how the existential crisis and the trauma of rootlessness stemming from the 1947 Partition have been transformed into a profound and unique connection with the 'mrittika - sanglagnata' in Tapan Bandyopadhyay's writings.

By applying the principles of Comparative Literature, the study evaluates how Leo Tolstoy's epic narrative structure influenced the expansive canvases of Tapan Bandyopadhyay's novels, such as 'Nadi Mati Aranya', 'Upama Kalidasasya', 'Birbal', 'Majestory', 'Dwairath' etc as acknowledged by the author himself. The findings reveal that while Tolstoy focused on moral and spiritual conflicts, Tapan Bandyopadhyay utilized his professional life experiences as a civil servant to analyze bureaucratic impacts and the grassroots populace within the contemporary socio-economic framework. Furthermore, the author's consciousness is analyzed in parallel with the philosophies of rootlessness espoused by Dutch writer Adriaan van Dis and Nobel laureate V. S. Naipaul.

Synthesizing the interview's primary data with perspectives from diverse readers, literary critics, and in the light of the philosophy of the eminent academician Prof. Sauren Bandyopadhyay, the research identifies certain gaps and limitations in Tapan Bandyopadhyay's five decade long 'Shabdabrahma' practice from a neutral scholarly viewpoint. These include the relative absence of Bengal's folk rhythms and labor movements, as well as

*perceived biases in the portrayal of certain marginalized female character like Dopati. Finally, the paper emphasizes the urgent need for literary translation to elevate his work to an international stage and achieve artistic fulfillment. This research proves that Tapan Bandyopadhyay's literary contributions are not merely commercial entertainment but serve as a documented testament to the evolution of contemporary Bengali literature, embodying a unique universal human appeal.*

## Discussion

প্রখ্যাত আমেরিকান মিউজিশিয়ান জিমি হেনড্রিক্সের গভীর দার্শনিক চেতনা সম্পন্ন বিখ্যাত উক্তি – “Knowledge speaks, but wisdom listens”<sup>১</sup> দ্বারা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাঝে একটি সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা সম্ভব। জ্ঞান যখন একাধারে তথ্য সরবরাহ করার মাধ্যম, অপরপ্রান্তে প্রজ্ঞা তখন যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণ নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও নিবিড় জীবন বোধ দিয়ে সেই তথ্যকে উপলব্ধি করে। তাইতো জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞানের কথা বলে জ্ঞান বিতরণ করেন আর প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কথা বলার চেয়ে অন্যের কথা শোনাকে বেশি গুরুত্ব দেন, কারণ শোনার মাধ্যমেই একই তথ্যকে নতুন বাস্তববাদী চেতনা দিয়ে বিশ্লেষণ করে উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত হওয়া সম্ভব।

এক্ষেত্রে প্রথিতযশা সাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন এমন ব্যক্তি যার মধ্যে জ্ঞানী হবার চেয়েও প্রাজ্ঞ হবার চেতনাক্রান্তি বেশি সক্রিয়। কর্মব্যস্ত প্রাত্যহিক জীবনযাপনের মধ্যেও সদা জাগ্রত সক্রিয় ষষ্ঠেন্দ্রিয় দ্বারা তিনি জীবনের প্রতি মুহূর্তে মূল্যায়ন করে চলেছেন নিজের পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি ও আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মানব মনের নানান দ্বন্দ্ব ও অভ্যুত্থানকে। আবার কখনও এসবের শিকড় খুঁজতে ডুব দিয়েছেন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির গর্ভে। বিচক্ষণ বিচারকের মতো তিনি তাঁর আহরিত দেশীয় জ্ঞানকে বিশ্বসাহিত্যের সাথে তুলনামূলক দৃষ্টিকোণে দেখেছেন।

বর্তমান গবেষণাপত্রটি রচনার ক্ষেত্রে মূলত তুলনামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণাপত্রটি রচনাকালে তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও মৌলিকত্ব নিশ্চিত করতে ক্ষেত্র সমীক্ষা পদ্ধতির অন্তর্গত কথাসাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন গবেষক (১৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬)। সেখানে সাহিত্যিককে নিজেরই সৃজনের একনিষ্ঠ পাঠক ও সমালোচক হিসেবে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং দীর্ঘ পাঁচ দশকে তাঁর সৃজনে বিশ্বসাহিত্যের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রভাব প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি জানান, -

“আমি আশৈশব গ্রন্থকীট। সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয় সেই প্রাথমিকে পড়ার দিনগুলিতে। যে বই হাতে পেতাম, ডুবে থাকতাম তার পাতায়। বিদেশি বই পড়তাম প্রচুর। অবশ্য এখনও তাই। তবে প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই, পরোক্ষ প্রভাব আছে। টলস্টয়ের ‘ওয়ার অ্যান্ড পিস’ পড়েই বড়ো মাপের উপন্যাস লেখার কথা ভাবি। যে উপন্যাসের ব্যাপ্তি হবে দীর্ঘ সময়কাল। প্রচুর চরিত্র থাকবে, মূল কাহিনির মধ্যে থাকবে উপন্যাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহু উপকাহিনি। উপন্যাসের মধ্যে ধরা থাকবে এক ব্যাপ্ত সময়কাল। ‘নদী মাটি অরণ্য’, ‘দ্বৈরথ’, ‘মালবকৌশিক’, ‘সমগ্র শঙ্খচিল’, ‘ম্যাজিস্টেরি’- সবই এই কনসেপ্ট থেকে লেখা। সবই ছ’শো আট’শো পাতার উপন্যাস। পাঠক ধৈর্য ধরে পড়লে আবিষ্কার করবেন এক-একটা সময়ের ইতিহাস।”<sup>২</sup>

এই উক্তিটিই তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপ্তির পরিচায়ক এবং তাঁর সাহিত্যজীবন নির্মাণে বিশ্বসাহিত্যের অবদান কতটা তা স্পষ্ট ইঙ্গিতবাহী। আহরিত সমুদ্রসম জ্ঞান ডানা মেলার জন্য শব্দে ভর করে রচনা করেছে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শব্দব্রহ্মের চক্রবৃহৎ, যার সময়কাল চলছে বিগত পাঁচ দশক ধরে। সাহিত্যিকের সাম্প্রতিক ডিজিটাল লিখন-পরম্পরা (ফেসবুক) পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনি নিজস্ব সাহিত্যকীর্তির ধারাবাহিক বিবরণীতে ‘শব্দব্রহ্মের সঙ্গে পাঁচ দশক’ বাক্যবন্ধটি ব্যবহার করেছেন।<sup>৩</sup> উক্ত ধারাবাহিকটি সাহিত্যিকের নিজস্ব ফেসবুক দেওয়ালে প্রকাশিত হলেও বর্তমানে এটি একটি

গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-সাহিত্যিক দস্তাবেজ হিসেবে বিবেচিত। এই ‘শব্দব্রক্ষ’ শব্দটি প্রয়োগের দার্শনিক দিকটা কী জানতে চাওয়ায় তিনি বলেছেন, -

“প্রতিটি শব্দের আলাদা ওজন আছে। ব্যবহারের গুণে তার দ্যোতনা বৃদ্ধি পায় আরও। শব্দের উপযুক্ত ব্যবহার উত্তীর্ণ করে কোনও বাক্যকে, মনের ভাবকে। শব্দই নিয়ন্ত্রণ করে মানবজাতিকে। ব্রক্ষের মতোই তার অনন্ত ক্ষমতা।”<sup>৪</sup>

বক্তব্যটি ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের এক সুগভীর ও মৌলিক ধারণা। ধ্বনিবিজ্ঞানের ব্যাকরণে শব্দ + ব্রক্ষ - এই দুই পদের মিলনে যে অখণ্ড সত্তার জন্ম, তা এক মহাজাগতিক সত্যের প্রকাশ মাত্র। বেদ-উপনিষদের যুগ থেকেই এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত। মহর্ষি ভট্টহরির ‘বাক্যপদীয়ম’ গ্রন্থের সূচনাতেই ‘শব্দব্রক্ষের’ বন্দনা করে লিখেছেন -

“অনাদিনিধনং ব্রক্ষ শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।

বিবর্ততৈর্থ্যভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ।।”<sup>৫</sup>

ভারতীয় দর্শন ও তন্ত্রশাস্ত্র অনুযায়ী, সৃষ্টির আদিতে ছিল একটি নাদ বা ধ্বনি (ওঁকার), যা ব্রক্ষের সগুণ রূপ। যা মূলত অব্যক্ত ব্রক্ষ, তাই সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায় স্পন্দিত হয়ে ‘শব্দ’ রূপে প্রকাশিত হয়। এই স্পন্দনই বিশ্বব্রক্ষাণ্ডের আকার ও প্রাণের আদি উৎস রূপে প্রকাশিত হয়। তাই সাহিত্যিকের কাছে এই ‘শব্দব্রক্ষ’ নিছক কোনও তাত্ত্বিক শব্দ নয়, বরং তাঁর জীবনব্যাপী চলমান এক সাধনা।

তন্ত্রশাস্ত্রে শব্দের চারটি স্তরের উল্লেখ মেলে যথা - পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা ও বৈখরী। ‘পরা’ হল আমাদের অব্যক্ত চেতনা, আর ‘বৈখরী’ আমাদের উচ্চারিত বা লিখিত শব্দ। সাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঁচ দশকের সাহিত্যযাত্রা মূলত এই ‘বৈখরী’ স্তরে প্রকাশিত শব্দের দ্বারা আদি ‘পরা’ সত্তা যাকে পরম ব্রক্ষ বলা হয়েছে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর এক নিরন্তর প্রয়াস। তাঁর লেখনীতে শব্দ শুধুমাত্র ভাব প্রকাশের মাধ্যম না, সেটি হয়ে উঠেছে তাঁর পরম উপাস্যের আরাধনা। নিরবিচ্ছিন্ন অক্ষরযাপন দ্বারা সাহিত্যিক তাঁর নশ্বর জীবন ও অভিজ্ঞতাকে অবিনশ্বর শব্দের বাঁধনে বেঁধে অমরত্বের উদ্দেশ্যে যে সাধনা করে চলেছেন, তাকেই তিনি ‘শব্দব্রক্ষের সঙ্গে পাঁচ দশক’ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন বলে প্রতীয়মান।

সাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সাধনা বিমূর্ত থেকে হয়েছে মূর্ত দর্শন। প্রকৃতির নদী, মাটি, অরণ্য, জীবজগত সহ সমকালীন পশ্চিমবঙ্গের বিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক চালচিত্রকে তিনি তাঁর সৃজনে ধারণ করে চলেছেন বিংশ শতকের সত্তর দশক থেকে। তাঁর মহাকাব্যিক উপন্যাসগুলির বিন্যাস একদিকে যেমন বিশ্বসাহিত্যের ধ্রুপদী কাঠামোর অনুসারী, অন্যদিকে তা বাংলার নিজস্ব ইতিহাস ও সংস্কৃতির এক অনন্য রূপতাত্ত্বিক দলিল হয়ে উঠেছে। তবে তাঁর সৃজনধারা শুধুমাত্র উপন্যাসের আঙিনায় প্রবহমানতায় সীমাবদ্ধ না থেকে ছড়িয়ে পড়েছে সাহিত্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে। তপন বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁচ দশকের সাহিত্য জীবন একশো ষাটটি গ্রন্থে সমৃদ্ধ। এছাড়া ছোটো-বড়ো সকল প্রকার লিটল ম্যাগাজিন-সহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকা, দৈনিক সংবাদপত্র, সাময়িকীগুলোরও তিনি নিয়মিত লেখক তিনি। প্রাসঙ্গিক ভাবে উল্লেখ্য যিনি বড়োদের জীবনের জটিলতাগুলোকে সাহিত্যের তুলিতে আঁকতে দক্ষ, সেই তিনিই অবলীলায় শিশু-কিশোরদের মনের নানান আবেগকেও নিপুণ ভাবে তুলে ধরতে সক্ষম। ভূত হোক বা রহস্য অথবা কল্পবিজ্ঞান এমন কোনও দিক নেই যেক্ষেত্রে তিনি আপন অক্ষর কীর্তির স্তম্ভ দাঁড় করাননি। তিনি মূলত কথাসাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করলেও তাঁর কাব্যধারাটিও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ছড়া, রুবাইয়াত, লিমেটিক, অনুবাদিত কবিতা, আধুনিক কবিতা সর্বক্ষেত্রে তিনি সমান দক্ষ। তাঁর এই বহুমুখী সৃজনশীলতা তাঁকে রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য উত্তরাধিকারী হিসেবে চিহ্নিত করে।

তবে সাহিত্য সমালোচকদের মতে যে কোনও মহৎ সাহিত্যের জন্ম হয় এক গভীর অস্তিত্ব সংকট থেকে। এই ধ্রুপদী সত্যটি যেন ক্রমশ সার্থক হয়ে উঠেছে সাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঁচ দশকের সাহিত্যজীবনে। তাঁর সাহিত্য সৃজনযাত্রার প্রেক্ষাপটের মূলে রয়েছে ১৯৪৭-এর দেশভাগ পরবর্তী কালে এক উদ্বাস্তু পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্যের অস্তিত্ববাদী সংকট এবং ইছামতীর নোনা জলহাওয়ার স্পর্শ। ব্যক্তিগত জীবনের সেই ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ট্রমাকে তিনি রূপান্তরিত করেছেন উচ্চাঙ্গ সাহিত্যে, যা মূলত সৃজনশীল উৎকর্ষ।

একজন সরকারি আমলার প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা এবং একজন সংবেদনশীল শব্দশিল্পীর কল্পনা কীভাবে পরস্পরের পরিপূরক হতে পারে, তাঁর প্রতিটি রচনা সেটা প্রমাণ করে। তাঁর প্রারম্ভিক জীবনের শিকড়হীনতার চেতনাকে ওলন্দাজ লেখক আদ্রিয়ান ফন ডিস বা ভি.এস. নাইপলের দর্শনের সমান্তরালে স্থাপন করা যায়। নাইপলের মতো তিনিও যেন সারাজীবন খুঁজে ফিরেছেন তাঁর হারানো ভূখণ্ডকে, যা কখনও ধরা দিয়েছে সুন্দরবনের বাদাবনে, কখনও মেদিনীপুরের মহলবনীর অরণ্যে।

এই গবেষণা পত্রের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় হল, লিও টলস্টয়ের মহাকাব্যিক বিস্তার এবং আদ্রিয়ান ফন ডিস ও নাইপলের শিকড় সন্ধানী চেতনা কীভাবে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিগত পাঁচ দশকের শব্দ সাধনায় উত্তর-উপনিবেশিক বঙ্গীয় ভূখণ্ডে চারিত হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করা।

**লিও টলস্টয় অনুযজে তপন চেতনা :** - গবেষকের গৃহীত সাক্ষাৎকারে সাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন তিনি লিও টলস্টয়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাঁর মতো বিশাল ক্যানভাস জুড়ে মহাকাব্যিক উপন্যাস রচনায় পারদর্শী তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তাঁর লেখা ‘নদী মাটি অরণ্য’, ‘দ্বৈরথ’, ‘ম্যাজেস্টোরি’, ‘সমগ্র শঙ্খচিল’ এবং ‘মালবকৌশিক’ উপন্যাস পাঁচটি ছ’শো থেকে আট’শো পৃষ্ঠার। অন্যদিকে ‘বীরবল’, ‘উপমা কালিদাসস্য’, ‘তত্ত্বমসি’, ‘খণ্ডবিখণ্ড’, ‘লাল শালু’, রেঞ্জারমামা সমগ্র এই উপন্যাসগুলো তিন’শো থেকে চার’শো পৃষ্ঠার। উপন্যাসগুলোর বিষয় গভীরতা ও চরিত্র নির্মাণের দক্ষতা দেখে সহজে অনুমেয় যে, গ্রন্থগুলি রচনার পূর্বে সাহিত্যিককে প্রচুর গবেষণা করতে হয়েছে। বিষয় বৈচিত্র্যের নিরিখে বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয়, বর্তমান বাংলা সাহিত্য জগতে একই কথাসাহিত্যিক বিভিন্ন বিষয়কে অবলম্বন করে উপন্যাস রচনার কথা খুব কমই ভেবেছেন বা লিখতে পেরেছেন সম্ভবত।

সাক্ষাৎকারে কথাসাহিত্যিকের বক্তব্য অনুযায়ী টলস্টয়ের ‘ওয়ার অ্যান্ড পিস’ পড়েই তিনি বড়ো মাপের উপন্যাস লেখায় মনোযোগী হন এবং রচনা করেন তিন খণ্ড যুক্ত মহাকাব্যিক উপন্যাস ‘নদী মাটি অরণ্য’। এটিই তপন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা লিখিত সবচেয়ে বড়ো উপন্যাস। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যজীবনকে নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রাবন্ধিক মনোজিংকুমার দাস তাঁর প্রবন্ধে ‘নদী মাটি অরণ্য’ উপন্যাসের ব্যাপ্তিময়তাকে সুস্পষ্ট করতে বিশিষ্ট সমালোচক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। সেখানে পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, -

“ ‘নদী মাটি অরণ্য’ উপন্যাসটি যে এ-যুগের রামায়ণ রচনার প্রচেষ্টা, একথা বিশেষভাবে বলে দেবার প্রয়োজন নেই। পাঠক উপন্যাসটি পড়লেই বুঝতে পারবে।”<sup>৬</sup>

টলস্টয় যেমন রাশিয়ার ভূখণ্ডকে পটভূমি করেছেন, ঠিক তেমনই তপন বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলকে ‘নদী মাটি অরণ্য’-এর পটভূমি করেছেন। এক সুবিশাল ক্যানভাস, ১৮৫০ খ্রি. - ১৯৫০ খ্রি. পর্যন্ত দীর্ঘ ১০০ বছরের সময়কাল এবং বৃহৎ ভৌগোলিক ক্ষেত্রকে বাংলা সাহিত্যে তুলে ধরার কারণে তিনিও চিত্রণ করেছেন প্রচুর চরিত্র। নির্দিষ্ট কোনও কেন্দ্রীয় চরিত্রের দোলাচালকে বিশেষ ভাবে আলোকিত না করে কথাসাহিত্যিক আলোকিত করেছেন অঞ্চলটির আর্থ-সামাজিক-প্রাকৃতিক অবস্থার সম্পূর্ণ চালচিত্র। যেখানে প্রকৃতিই হয়ে উঠেছে একটি মুখ্য চরিত্র, ওই অঞ্চলের মানবজীবনের নিয়ন্ত্রক। ‘নদী মাটি অরণ্য’-তে ফুটে উঠেছে সাধারণ মানুষের সহজ-সরল জীবনের পেছনে লুকিয়ে থাকা গভীর আবেগ ও জীবনবোধ।

তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করলে উপলব্ধিত হয় - তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ও টলস্টয়ের মতো ছোটো পরিসরের বদলে জীবনের বড়ো ক্যানভাস নির্বাচন করেছেন। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে টলস্টয়ের লিখনশৈলী, নৈতিক দ্বন্দ্ব এবং ইতিহাসের সাথে ব্যক্তিজীবনের সংঘাতের প্রভাব স্পষ্ট। টলস্টয় যেমন প্রথম জার আলেকজান্ডার ও নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মধ্যে বিধ্বংসী যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মাঝেও ব্যক্তিগত প্রেম ও পারিবারিক সম্পর্ককে বুনেছেন, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ও ঠিক তেমন নোনাডল, হিংস্র পশু ও রক্ষ প্রকৃতির মাঝেও মানুষের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের ইতিহাসনিষ্ঠ বিবর্তনকে ঝাঁকিয়েছেন।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলির বৃহত্তর প্রেক্ষাপট এবং ইতিহাসের সত্যনিষ্ঠ বয়ান পড়ার সময় বিশ্বসাহিত্য সমক্ষে সচেতন পাঠকের রুশ ঘরানার কথা মনে পড়বেই। ‘চাইল্ডহুড, অ্যাডোলোসেন্স, ইউথ’-এর লেভ টলস্টয়ের ছায়া তপন বন্দ্যোপাধ্যায় সৃষ্ট ‘সমগ্র শঙ্খচিল’ উপন্যাসের শঙ্খ চরিত্রের মাঝে। দুটি উপন্যাসই স্মৃতিচারণমূলক ও আত্ম অনুসন্ধানী জীবনী নির্ভর। টলস্টয় যেমন ‘চাইল্ডহুড, অ্যাডোলোসেন্স, ইউথ’-এ শৈশব থেকে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হয়ে ওঠার গল্প বলেছেন, ঠিক তেমন ভাবেই শঙ্খ চরিত্রের দ্বারা তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ও ফিরে দেখেছেন নিজের অতীতকে। টলস্টয়ের চিরন্তন শৈশব, কৈশোর ও তারুণ্যই যেন তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে শঙ্খ চরিত্র রূপে ছিন্নমূল বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে নিজের আত্ম পরিচয়কে ঘিরে অস্তিত্ববাদী সংকটে ধুকছে। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক অধ্যাপিকা ড. শ্রাবণী পাল ‘সমগ্র শঙ্খচিল’ উপন্যাসের আলোচনায় লিখেছেন, -

“পরিণত বয়সে স্মৃতিসরণিতে পদচারণা করে শৈশব-কৈশোরের সিন্দুক খুলে তিনি তুলে এনেছেন অপূর্ব সব মণিমুক্তো। শৈশব থেকে কৈশোরে, বয়ঃসন্ধির অভিজ্ঞতায় মথিত হয়ে অনেক বিনীত রাত কাটিয়ে যৌবনে পা দিয়ে জীবনের রূপ-রসের পাশাপাশি নারীশরীরের ঘ্রাণ নিয়ে ক্রমশ হয়ে উঠেছেন আরেক জীবনপথের পথিক-সেখানে সৃষ্টির বিচিত্র কারুকাজ আর বৈভব। সমগ্র শঙ্খচিল সেই জীবনের অন্তরঙ্গ ও অকৃত্রিম ভাষ্য।”<sup>৭</sup>

টলস্টয়ের ‘আম্মা কারেনিনা’-তে যেমন অভিজাত সমাজ বনাম ব্যক্তির অস্তিত্ব দ্বন্দ্ব দেখা যায়, নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি শঙ্খ চরিত্রটির মধ্যেও একপ্রকার মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন, দ্বন্দ্ব বর্তমান। ভারত ভাগ, স্বাধীনতা-উত্তর কালের দাঙ্গা এবং উদ্বাস্তু সমস্যা জর্জরিত প্রবহমান সময়ের সাথে শঙ্খের উদ্বাস্তু জীবনকে এক সূতোয় বেঁধেছেন তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিকূল সমাজ ও সময়ের মধ্যে টিকে থেকে শঙ্খ নিজের মানবিক সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখার চরম লড়াই চালিয়েছে সর্বক্ষণ। কথাসাহিত্যিক এই তথ্যটি আলোচক শ্রাবণী পাল মহাশয়াকে তথ্যপুষ্ট করতে বলেছিলেন, -

“সমগ্র শঙ্খচিল উপন্যাসের বিষয়বস্তুর শুরু স্বাধীনতার জন্মলগ্ন থেকে, পটভূমি কলকাতার অদূরে ইছামতী সংলগ্ন এক গ্রামের, আবর্তিত হয়েছে স্বাধীনতার পরবর্তী আড়াই দশক ধরে, গ্রাম থেকে শহর কলকাতায়। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র উদ্বাস্তু পরিবারের এক বালক শঙ্খ, তার পায়ের নীচে মাটি নেই, তাকে লড়াই করে অর্জন করতে হবে সেই মাটি, চরিত্রটির মধ্যে কোথাও মিশে আছে আমার সত্তা। এটি এক অর্থে আমার আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস।”<sup>৮</sup>

টলস্টয়ের ইতিহাস চেতনার দিক থেকে তুলনামূলক মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ও ‘বীরবল’, ‘উপমা কালিদাসস্য’ উপন্যাসে ইতিহাসকে কেবল পটভূমি নয়, বরং এক জীবন্ত চরিত্র হিসেবে প্রতিভাত করেছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে গুসকরা, বর্ধমানের এক পাঠক সুবিমল দত্তের বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, -

“শ্রদ্ধেয় লেখক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক উপন্যাস ‘উপমা কালিদাসস্য’ পড়ছি। ঐতিহাসিক উপন্যাস মানে শুধু যে একটি ইতিহাসের গল্প নয়, এই লেখা পড়লে তা বোঝা যায়। উপন্যাস পড়ার সময় আমরা ঢুকে যাচ্ছি কালিদাসের কালে। সেই সময়কার নাগরিক সমাজ, আমলাতন্ত্র সবকিছুই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন উপন্যাসিক। তাঁর ভাষা ব্যবহার ও বিবরণের গুণে আমরা পাঠকরাও হাজার বছর আগের সেই সময়ে প্রবেশ করি। গন্ধ পাই প্রাচীন সেই যুগের। লেখক হিসেবে এটি তাঁর মুঙ্গিয়ানা।”<sup>৯</sup>

বিশ্বসাহিত্যের দিকে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করলে দেখা যাবে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলোতে টলস্টয়ের রুশ ধ্রুপদী সাহিত্যে ছাপ সবচেয়ে বেশি প্রকট হলেও এই দুই সাহিত্যিকের শিকড়, সৃজনের প্রেক্ষাপট এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে বেশ কিছু মৌলিক পার্থক্যও রয়েছে।

টলস্টয়ের উপন্যাসের প্রেক্ষাপট মূলত উনিশ শতকের রাশিয়ায় জারের শাসন, নেপোলিয়নের যুদ্ধ এবং রুশ অভিজাততন্ত্র ও কৃষক সমাজের মধ্যকার ব্যবধান। কিন্তু তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার বৃহত্তর অংশ জুড়ে আছে ভারত ও বাংলাদেশ। মাটির টান, প্রকৃতির সাথে একাত্মবোধ ও গ্রামীণ মানুষের জীবন তাঁর সাহিত্যে বেশি প্রকট।

জীবনের শেষভাগে টলস্টয় প্রচণ্ডভাবে আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক হয়ে উঠেছিলেন। তার প্রতিফলনে সাহিত্যে দেখা গেছে মানুষের নিজের সাথে নিজের Moral struggle। তাঁর লক্ষ্য ছিল ‘সমগ্র জীবন’-কে সাহিত্যবন্দী করা। কিন্তু তখন বন্দোপাধ্যায় হলেন আদ্যোপান্ত আধুনিক চেতনাসম্পন্ন গদ্যশিল্পী। তাঁর লেখায় ভাষা সাবলীল। রচনাগুলিতে আধ্যাত্মিকতার চেয়ে সাধারণত সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তন, মানব হৃদয়ের আর্তি বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁর সৃজনে সমাজ ব্যবস্থার মন্দ দিকগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই প্রকট। অর্থাৎ তখন বন্দোপাধ্যায়ের লেখায় ব্যক্তিগত চেতনার চেয়ে শ্রেণি চেতনার প্রভাব অনেক বেশি স্পষ্ট। তিনি চরিত্রের নৈতিকতার চেয়ে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই (যেমন - দোপাটি চরিত্রটি) এবং ইতিহাসকে সত্যনিষ্ঠ বাস্তববাদী ভঙ্গিতে (যেমন, কালিদাস বা বীরবল চরিত্র) তুলে ধরে চলেছেন পাঠকের কাছে।

নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসঙ্গ আসলে বলা চলে তখন বন্দোপাধ্যায়ের লেখায় গার্মী, দোপাটি, সুরঞ্জনার মতো নারী চরিত্রগুলো অনেক বেশি স্বাধীনচেতা এবং আধুনিক জীবনবোধ সম্পন্ন। কিন্তু টলস্টয় উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলোকে শক্তিশালী তৈরি করলেও শেষ পর্যন্ত সমাজের প্রথাগত নৈতিকতাই বড়ো হয়ে উঠেছে যেমন - আল্লা কারেনিনা চরিত্রটি।

সংক্ষেপে বলা চলে, টলস্টয় ছিলেন একজন দার্শনিক-সাহিত্যিক, আর তখন বন্দোপাধ্যায় হলেন একজন গবেষক তথা আধুনিক কথাসাহিত্যিক। একজন মানুষের আত্মিক মুক্তির পথ খুঁজেছেন, অন্যজন বিগত পাঁচ দশকের ইতিহাস থেকে মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামকে সময়ের ধারা অনুসারে ইতিহাসনিষ্ঠ ভাবে নথিভুক্ত করে চলেছেন। একজন সরকারি আমলা হিসেবে তখন বন্দোপাধ্যায়ের যে অভিজ্ঞতার ঝুলি, তা তাঁর লেখাকে টলস্টয়ের চেয়ে কিছুটা বেশি প্রায়োগিক বা প্রশাসনিক বাস্তবতার কাছাকাছি নিয়ে আসে।

বিশ্বসাহিত্যের সাথে শব্দব্রহ্মের পাঁচ দশকের রচনার তুলনামূলক আলোচনায় টলস্টয়ের প্রাসঙ্গিকতায় তখন বন্দোপাধ্যায়ের নিজস্ব অভিমত জানতে চাইলে তিনি স্বভাবজাত বিনয়ের সাথে সংশয় প্রকাশ করে ব্যক্ত করেন যে, -

“বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের তুলনামূলক গবেষণা বিরল। প্রাবন্ধিকের অনুসন্ধান সঠিক পথ অনুসারী।

তবে লিও টলস্টয়ের সঙ্গে আমার তুলনা বাঙালি পাঠক নেবেন তো? আশা করি পাঠকমহল নিশ্চয়ই নড়েচড়ে বসবেন।”<sup>১০</sup>

সাহিত্যিক তখন বন্দোপাধ্যায়ের সমর্থন, অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে উক্ত গবেষণাপত্রে তখন বন্দোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যিকসুলভ চেতনায় লিও টলস্টয়ের মহাকাব্যিক ব্যাপ্তির প্রভাব কী রূপ তা আলোচনার পর যথাক্রমে আদ্রিয়ান ফন ডিস এবং ভি. এস. নাইপল এর দর্শনের প্রেক্ষাপটে তখন বন্দোপাধ্যায়ের উত্তর-উপনিবেশিক শিকড় সন্ধানী চেতনা ও তাঁর উদ্বাস্তু জীবনের প্রয়োগবাদী রূপান্তরকে বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

#### বিশ্বসাহিত্যে শিকড়হীনতা এবং তখন চেতনা : -

**আদ্রিয়ান ফন ডিস :** ওলন্দাজ সাহিত্যিক আদ্রিয়ান ফন ডিস এর জীবনবোধ গড়ে উঠেছে তাঁর বিচিত্র পারিবারিক ইতিহাস, ঔপনিবেশিক প্রভাব এবং ভ্রমণের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। যুদ্ধের ট্রমাগ্রস্ত পরিবারে তাঁর শৈশব কেটেছে এবং পারিবারিক সূত্রে তিনি ইন্দোনেশিয়া (তৎকালীন ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ) থেকে নেদারল্যান্ডসে ফিরে আসেন। দুই ভিন্ন সংস্কৃতির আত্মীকরণজনিত সংঘাতের অভিজ্ঞতাকেই সাহিত্যিক তাঁর ইতিহাসনিষ্ঠ লেখনীতে নিজস্ব পরিচয় বনাম ঐতিহ্যের লড়াই হিসেবে ফুটিয়ে তুলেছেন। শিকড়হীনতার চেতনা থেকে তাঁর জীবন বোধে অন্যের প্রতি গভীর কৌতূহল এবং সহানুভূতি জন্মেছে, বিশেষ করে অভিবাসী ও ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের প্রতি। সামাজিক বৈষম্য, বর্ণবাদ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য বিরোধী সংগ্রামের মতো বিষয়গুলো তার জীবন দর্শনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই ওলন্দাজ লেখক আদ্রিয়ান ফন ডিস এবং ভারতীয় বাঙালি লেখক তখন বন্দোপাধ্যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষ হলেও তাঁদের সাহিত্য ভাবনার ক্ষেত্রে কিছু সাদৃশ্য এবং মৌলিক বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়।

দু’জনেই শেকড়হীন হওয়ার বেদনাকে নিজস্ব জীবন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। ফন ডিস ইন্দোনেশিয়া থেকে নেদারল্যান্ডসে ফিরে আসা এক প্রত্যাবাসিত পরিবারের সন্তান। অন্যদিকে, তখন বন্দোপাধ্যায় তৎকালীন পূর্ববঙ্গ থেকে আসা এক শরণার্থী পরিবারের উত্তরসূরি। এই হারিয়ে যাওয়া ভিটে মাটির স্মৃতি ও অস্তিত্ব সংকট তাঁদের উভয়েরই

সাহিত্যচর্চার প্রেরণা। আদ্রিয়ান ফন ডিস-এর লেখায় যেমন আফ্রিকা বা ইন্দোনেশিয়ার প্রসঙ্গ আছে, ঠিক তেমনই সাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার প্রান্তিক মানুষ ও আদিবাসী জনজীবনের সংস্কৃতি, অস্তিত্ব সংকট ও অভিযোজনের ইতিহাস ফুটে ওঠে। বিশেষত ‘নদী মাটি অরণ্যে’ সুন্দরবন ও মহলবনী ট্রিলজিতে (‘মহলবনীর সেরেঞ’, ‘সেংগেল’ ও ‘মায়াম’) মেদিনীপুর এলাকার সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

দুই সাহিত্যিকেরই গদ্যরীতি অত্যন্ত সরল ও ঝরঝরে। ফন ডিস মনে করতেন, যুদ্ধের মত জটিল ও নির্যাতনের মত সংবেদনশীল বিষয়কে সাহিত্যে প্রকাশ করার জন্য সহজ সরল ভাষা সবচেয়ে বেশি কার্যকর। অন্যদিকে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখনশৈলীও অত্যন্ত প্রসাদগুণ সম্পন্ন। ‘ম্যাজিস্টোরি’, ‘দ্বৈরথ’, ‘তত্ত্বমসি’ ইত্যাদি পড়লে বোঝা যায় দীর্ঘ প্রশাসনিক কর্মজীবনের অভিজ্ঞতায় আমলাতন্ত্রের ব্যবচ্ছেদ, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত রাজনীতি ও নারী ক্ষমতায়ন থেকে শুরু করে উপনিষদের পরা ও অপরা বিদ্যার মতো দর্শনের গূঢ়তত্ত্ব মাঝের জটিল বিভেদকে পাঠকের কাছে সহজ সরল ভাষায় বোধগম্য করে তুলতে সিদ্ধহস্ত।

তবে দু’য়ের সাহিত্য চেতনার মাঝে সূক্ষ্ম অমিলও পরিলক্ষিত হয়। আদ্রিয়ান ফন ডিস-এর সাহিত্য চেতনা মূলত পরিচয় সংকট, বর্ণবাদ কেন্দ্রিক ট্রমাকে ঘিরে আবর্তিত। কিন্তু তপন বন্দ্যোপাধ্যায় কথাসাহিত্য বিষয় বৈচিত্র্যের দিক থেকে অনেক বেশি প্রসারিত। ‘উপমা কালিদাসস্য’ মতো ঐতিহাসিক উপন্যাস, গার্গীর গোয়েন্দা কাহিনি, ‘আয় দূরী, চিঠি লিখি’-র মতো কিশোরী উপন্যাস, ভৌতিক গল্প থেকে শুরু করে প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক বিষয়ে তিনি লিখেছেন।

সাহিত্যিক আদ্রিয়ান ফন ডিস মূলত দ্বৈততার প্রেক্ষাপটে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনকে বিশ্লেষণ করেছেন। বিপরীতে, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশি আঞ্চলিক ও গবেষণামূলক। তাঁর লেখায় মাটি ও মানুষের খুব নিবিড় যোগসূত্র ফুটে উঠে মহাকাব্যিক রূপ পায় (যেমন: ‘নদী মাটি অরণ্য’)।

**ডি.এস.নাইপল :** সাহিত্যিক ডি.এস. নাইপলের জীবন চেতনা মূলত ঔপনিবেশিক প্রভাব, শিকড়হীনতা, নির্বাসন এবং আত্মপরিচয়ের সন্ধানের এক জটিল মিশ্রণ। ত্রিনিদাদে জন্ম নেওয়া এবং পরে ইংল্যান্ডে বসবাসকারী এই নোবেলজয়ী লেখক তাঁর লেখায় ও ব্যক্তিগত জীবনে তৃতীয় বিশ্বের মানুষের সংগ্রাম, ভঙ্গুর সমাজ ও ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্নতাকে তীক্ষ্ণ নির্মোহতার সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন।

নাইপল নিজের ফেলে আসা সমাজ বা সংস্কৃতির প্রতি কঠোর, সমালোচনামূলক এবং নৈর্ব্যক্তিক দূরত্ব বজায় রেখে নিজেকে অনেকটা ছিন্নমূল পরিব্রাজক এ পরিণত করেছিলেন। কিন্তু সাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বুকেও দেশভাগের যন্ত্রণা, অস্তিত্ববাদী সংকট থাকলেও তিনি নিজেকে বাংলার নদী, মাটি এবং অরণ্য, প্রান্তিক জনমানসের সাথে একাত্ম করতে পেরেছেন। কর্মসূত্রে তিনিও বিভিন্ন ক্ষেত্র পরিব্রাজন করেছেন কিন্তু নিজেকে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির থেকে ছিন্ন না করে বরং করেছেন একাত্ম। হয়ে উঠেছেন প্রান্তিক মানুষের জনস্রোতেরই একজন।

নাইপলের দৃষ্টিভঙ্গি যেখানে তাত্ত্বিক ও দার্শনিক, তপন বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে তাঁর প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার কারণে পশ্চিমবঙ্গের রুঢ় বাস্তবের একেবারে গভীরে ঢুকে মানুষের বেঁচে থাকার লড়াইকে ভেতর থেকে মূল্যায়ন করেছেন। নাইপল ভারতীয় বংশোদ্ভূত হিসেবে ত্রিনিদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে লন্ডনে স্থায়ী হওয়ার কারণে আজীবন নিজেকে এক প্রবাসীই ভেবেছেন। এই বিচ্ছিন্নতাবোধ তাঁর সাহিত্য ও চিন্তার কেন্দ্রে অবস্থান করেছে। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে উত্তর-ঔপনিবেশিক কালে বিশ্বের অনেক দেশের মানুষ তাদের নিজস্ব ইতিহাস ও সংস্কৃতি হারিয়ে ছিন্নমূল হয়ে অস্তিত্ব সংকটে ভুগে চলেছে। ব্যক্তিগত জীবনে প্রচণ্ড দারিদ্র্য এবং বর্ণবাদের সম্মুখীন হয়েও তিনি লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস সংগ্রাম করেছেন। তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল সাহিত্যে উৎকর্ষ সাধন। তাই নাইপলের জীবন চেতনা কেবল হতাশাপূর্ণ নয়, বরং এটি একটি আত্ম-অনুসন্ধানী প্রক্রিয়া, যা বিশ্বজুড়ে মানুষের স্থানচ্যুতি ও পরিচয়ের জটিলতাকে বুঝতে সাহায্য করে।

এক্ষেত্রে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেতনা অনেক বেশি আত্মীকরণধর্মী এবং মৃত্তিকাসংলগ্ন। তাঁর সাহিত্যে কেবল শিকড়হীনতার হাহাকার, নির্বাসিত যাতনায় আটকে নেই, বরং হারানো ভূখণ্ডের ক্ষত সমকালীন পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃতি ও মানুষের নিবিড় সাহচর্যে এক নতুন সাংস্কৃতিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে পূর্ণতা দিয়ে চলেছে।

তুলনামূলক আলোচনায় সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, নাইপল বা আদ্রিয়ান ফন ডিস-এর শিকড়-সন্ধানী সাহিত্যে যখন এক প্রকার কড়া সমালোচনা, বিচ্ছেদজনিত তিক্ততা বা ‘আউটসাইডার’ সুলভ নিরাসক্তি প্রবল। অপরপ্রান্তে ঠিক তখনই বাস্তবহারা সত্তার হাহাকারকে তপন বন্দ্যোপাধ্যায় মেদিনীপুরের অরণ্য বা সুন্দরবনের বাদাবনের মৃত্তিকা-চেতনার সঙ্গে লীন করে দিয়ে এক অনন্য উত্তর-উপনিবেশিক আত্মপরিচয় নির্মাণ করে স্বাতন্ত্র্যতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি কেবল একজন কথাসাহিত্যিক নন, বরং সমকালের একজন ‘ক্রনিকলার’। তাঁর সাহিত্যচর্চা প্রমাণ করে যে, আঞ্চলিকতায় শিকড় যত গভীরে প্রোথিত থাকে ডালপালা তত বেশি বিশ্বসাহিত্যের আকাশে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তপন বন্দ্যোপাধ্যায় অস্তিত্ব সংকটের চেতনা ও আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করে সাহিত্যের মাঝে এক বিশ্বজনীন মানবিক আবেদন তৈরি করতে পেরেছেন। তাই তাঁর ‘শব্দব্রক্ষের সাধনা’ কেবল অতীত রোমন্থন নয়, বরং তা বর্তমান ও ভবিষ্যতের সাহিত্যিকদের, মূলত কথাসাহিত্যিকদের জন্য এক নতুন পথের দিশারি।

**শব্দব্রক্ষের সাধনাতে সীমাবদ্ধতার অন্বেষণ :** যদিও এ মানব জীবনে কেউই পূর্ণ না, কিছু না কিছু অপূর্ণতা থেকেই যায়। বিপুল সৃষ্টির মাঝে কিছু ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকাটা তাই অনিবার্য, এটাই সৃষ্টির নিয়ম। সেই নিয়মেই সাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শব্দব্রক্ষের সাধনায় এক ‘শ’ যাটটি গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও কিছু শূন্যস্থান এখনও রয়ে গেছে। একজন গবেষকের দৃষ্টিকোণ থেকে ঔপন্যাসিকের সৃজনকে বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি প্রায় সব রকম বিষয়কেই সাহিত্যে বন্দি করার চেষ্টা করছেন এবং বয়সে আশির দোরগোড়াতো এসেও তাঁর কলম চিরযুবা। তাঁর চলমান শব্দব্রক্ষের সাধনা মাটির কাছের মানুষদের কথা বললেও শ্রমজীবী মানুষের কথা বা শ্রমিক আন্দোলনের কথা এখনও বলেনি। তাঁর প্রায় প্রতি রচনায় রৈবীন্দ্রিক প্রভাব প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে প্রকট। তবুও তাঁর সাহিত্যে বাউল অনুষঙ্গটি অনুপস্থিত। রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে লিখছেন ‘প্রহর শেষের রাঙা আলোয়’ নামক উপন্যাস এবং ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতকে কেন্দ্র করে শিল্পী বৈজু মহারাজের জীবনবৃত্তান্তকে অবলম্বন করে লিখেছেন ‘মালবকৌশিক’ উপন্যাসটি। সঙ্গীত নিয়ে এহেন উপন্যাস রচনার প্রয়াস বাংলা তথা বিশ্বসাহিত্যে বিরল; উজ্জ্বল ব্যতিক্রম তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁর কলমে আমাদের বাংলার মাটির নিজস্ব লোকজ সুর, যেমন - সারিগান, জারিগান, গম্ভীরা, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি ইত্যাদি উদ্ভাসিত হওয়া এখনও বাকি। যদিও তাঁর রচিত ‘মহলবনী ট্রিলজি’-তে লোকসংস্কৃতির উজ্জ্বল নির্দশন রয়েছে। তপন বন্দ্যোপাধ্যায় আদিবাসীদের লোকউৎসব, লোকবিশ্বাস, শিকার, লোকখাদ্য ও লোকভাষার বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন মহলবনী সিরিজে। ‘দ্বৈরথ’ উপন্যাসেও দোপাটি চরিত্রটিকে মুখে মুখে ছড়া কাটতে দেখা যায়, এই ছড়া লোকসংস্কৃতির এক উজ্জ্বল অথচ বিলুপ্তপ্রায় অঙ্গ। মূর্খ কালিদাসের বহুল প্রচলিত লোকগাঁথা বা লোকশ্রুতিকে তিনি ধ্রুপদী ইতিহাস নির্ভর উপন্যাসিক রূপ দিয়েছেন (‘উপমা কালিদাসস্য’)।

অন্যদিকে তপন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেমকে পবিত্র আধ্যাত্মিকতার আলোয় আলোকিত করেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে, কিন্তু বর্তমান সময়ে দ্রুত পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে প্রেমের সংজ্ঞা ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় পবিত্র, নিঃস্বার্থ প্রেমও হয়ে উঠছে অসহায়, চক্রান্তের শিকার। এধরণের টানাপোড়েন যুক্ত জটিল মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের সৃজন তাঁর কলমে এখনও বাকি।

‘উপমা কালিদাসস্য’ উপন্যাসে কথাসাহিত্যিক নারীদেহকে সৌন্দর্যের আধার রূপে দেখেছেন। যৌনতাকে অশ্লীলতার দৃষ্টিকোণে না দেখলেও দ্বৈরথে ‘দোপাটি’ চরিত্রটির সাথে পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গটিকে প্রতিষ্ঠা করে সদ্য প্রয়াত কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও আলোচক নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য। তিনি ‘দ্বৈরথ’-এর আলোচনায় লিখেছেন, -

“দোপাটির মন-জুড়ে কামজ্বরের এই যে নিঃশব্দ ফ্রেয়েডীয় বিশ্লেষণ; এরকম সূক্ষ্মতাও আজকাল বাংলা উপন্যাসে তেমন নজরে পড়ে না।”<sup>১১</sup>

‘উপমা কালিদাসস্য’-র নায়িকা পান নান্দনিক শ্রদ্ধা, রহস্যভেদী বুদ্ধিদীপ্ত গার্গী পান বৌদ্ধিক সম্মান, কিন্তু প্রান্তিক চরিত্র দোপাটি পান কেবলই শারীরিক ব্যবচ্ছেদ। নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্র থেকে বিচার করলে বিদ্যোত্তমা নিজ পাণ্ডিত্য ও শ্রেষ্ঠত্বের দ্বারা মূর্খ স্বামী কালিদাসকে পরম জ্ঞানী ও যুগ শ্রেষ্ঠ পুরুষ হিসেবে নির্মাণ করে নিজেকে পরোক্ষভাবে গৌরবান্বিত করে থেকেছেন নিঃসঙ্গ অন্তরালে। যেন পুরুষের জয়েই নারীর আসল বিজয় লুক্কায়িত। অন্যদিকে আধুনিকা গার্গী পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রভাব মুক্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ নারী। কিন্তু দোপাটি! সে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিস্পর্ধী হতে গিয়ে পুরুষকেই করেছে ক্ষমতায়নের হাতিয়ার। ফলস্বরূপে প্রচলিত সামাজিক ধারণা অনুযায়ী টলস্টয়ের আল্লা কারেনিনার মতো তাঁর মৃত্যু না ঘটলেও জুটেছে চরম একাকিত্ব ও পরাজিত জীবন। গার্গীর মতো উজ্জ্বল নারী চরিত্র যিনি সৃষ্টি করতে পারেন, তিনি কেন দোপাটির মতো লড়াকু চরিত্রটিকে সময়ের স্রোতে প্রবহমান এক অসহায় চরিত্র রূপে নির্মাণ করে সংকীর্ণ গণ্ডিতে রাখলেন - এই প্রশ্নটি ভাবায়। যদিও ভাবনার কোনও শেষ নেই। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও প্রবহমান কালের সেরা প্রাবন্ধিক অধ্যাপক ড. সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায় এক সেমিনারে বলেছিলেন, -

“ভাবতে ভাবতেই মানুষ চেনা তথ্যের মধ্যেও নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করে চলেছে প্রতিনিয়ত, এভাবেই উন্মোচিত হচ্ছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের নানান জটিল রহস্য।”<sup>১২</sup>

তাঁর এই দর্শনকে বিশ্লেষণ ও অনুসরণ করে বলাই যায় যে, পাঠকের মেধা ও মনন ভেদে সাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুবিশাল সাহিত্য-কীর্তি নব নব রূপে ধরা দেবে। তাঁর শব্দব্রহ্মের সঙ্গে পাঁচ দশকের সাহিত্য জীবনের আলোচনাকে একটিমাত্র প্রবন্ধে পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করা অসম্ভব। বর্তমান আলোচনাটি তাঁর সৃষ্টিসম্ভারের মধ্য থেকে শুধুমাত্র কথাসাহিত্যগুলোকে বিশ্বসাহিত্যের ধ্রুপদী নিরিখে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার প্রয়াস মাত্র। সময়ের সংক্ষিপ্ততা ও প্রবন্ধের নির্দিষ্ট পরিসরের সীমাবদ্ধতাকে মাথায় রেখেই বলা যায়, এই বিশ্লেষণ তাঁর সাহিত্য-দর্শনের নিরন্তর অন্বেষণের একটি তাত্ত্বিক দস্তাবেজ মাত্র।

এই তাত্ত্বিক অন্বেষণ করতে গিয়ে মনে হয়েছে, তপন বন্দ্যোপাধ্যায় লিটল ম্যাগাজিনের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামেরও একজন সহ-যোদ্ধা কারণ তিনি বড়ো বড়ো বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকা, দৈনিক সংবাদপত্রগুলোর পাশাপাশি প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে প্রকাশিত অখ্যাত লিটল ম্যাগাজিনগুলোকেও সমহারে গুরুত্ব দিয়ে সেগুলোতেও নিয়মিত লেখালিখি করে চলেছেন। যেগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোট প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা এতদিনে হয়তো পাঁচ শতাধিক হয়ে যেত। সীমিত সময়ে বিপুল পরিমাণ সৃষ্টির তাগিদে সাহিত্যিকের সব সৃজন সমভাবে তাঁর শিল্প-সত্তার অনুসারী হয়ে ওঠেনি। সেক্ষেত্রে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বকীয় ‘শব্দব্রহ্মের সাধনা’-র চেয়েও আকস্মিক সৃজনের প্রেরণা অধিক প্রাধান্য পেয়েছে বলে মনে হয়। দু’বার সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত একজন বিদগ্ধ স্রষ্টার কাছে পাঠকের যে প্রত্যাশা থাকে, সেই নিজস্ব সত্তার প্রতিফলন কিছু গল্প, উপন্যাসে খানিকটা ম্লান বলেই প্রতীয়মান।

বিশ্বসাহিত্যের নিরিখে কোনো স্রষ্টার সৃষ্টির মূল্যায়ন এবং অনুবাদ সাহিত্য - এই দুই ধারা একে অপরের পরিপূরক। অথচ এই সমান্তরাল ধারায় একটি বড়ো শূন্যস্থান নজরে পড়ে রবীন্দ্র-অনুরাগী তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ‘গীতাঞ্জলি’-র অনুবাদ করতে গিয়েই ‘Song Offerings’ এর মতো নোবেলজয়ী অনুসৃষ্টির জন্ম হয়েছিল, সে ইতিহাস সকলের জানা। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন, সৃজনকে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে দেবার উদ্যোগ স্রষ্টাকেই নিতে হয়। যেহেতু তপন বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের অমূল্য সৃষ্টিগুলোকে বিশ্ব-দরবারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে অনুবাদের ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত বিশেষ কোনো জোরালো উদ্যোগ গ্রহণ করেননি, সেহেতু সময়ের দাবি অনুযায়ী সেই পদক্ষেপ খুব শীঘ্রই সাহিত্যিকের নেওয়া উচিত। হয়ত তবেই তাঁর শব্দব্রহ্মের সাধনা পূর্ণতা পাবে এবং আগামীতে বাঙালি পাঠক সহ আন্তর্জাতিক মহলের পাঠক সমাজ তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে ‘ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিডিউড’ বা ‘ইউলিসিস’-এর মতো মহাকাব্যিক ব্যাপ্তিসম্পন্ন আরও কিছু সমৃদ্ধ উপন্যাসের স্বাদ পাওয়ার সুযোগ পাবেন।

সর্বোপরি একথা বলাই যায়, বিগত পাঁচ দশকে বাঙালি পাঠক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শব্দব্রহ্মের সাধনার ফলস্বরূপে যা পেয়েছে তাইই বা কম কী! বাংলার প্রকৃতি, রাজনীতি এবং ইতিহাসের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে যখন কোনো সংবেদনশীল মানুষ জীবনের অর্থ খুঁজবে, তখনই তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পাঁচ দশকের সাহিত্যকর্ম এক অপরিহার্য দালিলিক পাঠ হিসেবে বিবেচিত হবে। লিও টলস্টয়ের মহাকাব্যিক বিস্তার কিংবা আদ্রিয়ান ফন ডিস ও নাইপলের শিকড়-সন্ধানী চেতনার যে প্রতিফলন তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীতে মেলে তা বাংলার আঞ্চলিক গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকার নয়, অপেক্ষা শুধু উপযুক্ত সময়ের। তাঁর দীর্ঘ সময়ব্যাপী শব্দব্রহ্মের সাধনা যখন অনুবাদ সাহিত্যের সেতুবন্ধ পেরিয়ে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে সমাদৃত হবে তখন আবারও একবার মহিমাম্বিত হয়ে উঠবে আমাদের মাতৃভাষা, বাংলা ও বাঙালি জাতি।

### Reference:

১. হেনড্রিক্স, জিমি, ব্রেইনি কোট, [www.brainyquote.com/quotes/jimi\\_hendrix\\_103615](http://www.brainyquote.com/quotes/jimi_hendrix_103615)
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, টুস্পা দে কর্তৃক গৃহীত, তারিখ - ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, ‘শব্দব্রহ্মের সঙ্গে পাঁচ দশক’, ফেসবুক, তারিখ - ৮ জানুয়ারি - ৩১ জানুয়ারি ২০২৬, ধারাবাহিক স্মৃতিচারণমূলক নিবন্ধ। পোস্ট লিঙ্ক- <https://www.facebook.com/share/p/1ZtcQ8AfA4/>
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার (পূর্বোক্ত)।
৫. ভর্তৃহরি, বাক্যপদীয়ম (প্রথম কাণ্ড), সম্পাদিত ও অনূদিত কে. এ. সুরক্ষণ্য আইয়ার, মোতিলাল বেনারসীদাস, ১৯৬৫, Internet Archive, archive.org.
৬. দাস, মনোজিৎকুমার, ‘তপন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর গল্পে ডকুমেন্টেশনের চেয়েও বেশি প্রকাশিত হয় মানুষের প্রতি ভালোবাসা’, পেজফোরনিউজ, ৪ জানুয়ারি ২০২৩, <https://pagefournews.com/tapan-banerjees-story-reveals-love-for-people-more-than-documentation/>
৭. পাল, শ্রাবণী, ‘সমগ্র শঙ্খচিল’ : একটি আলোচনা’, আরাট্রিক পত্রিকা (তপন বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা), বর্ষ ২৭, সংখ্যা - ২য়, জানুয়ারি ২০২৪, পৃ. ৪৮
৮. পাল, শ্রাবণী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২
৯. দত্ত, সুবিমল, ‘উপমা কালিদাসস্য : একটি পাঠ প্রতিক্রিয়া’, কৃতিবাস পত্রিকা, তারিখ - ১ এপ্রিল, ২০২৫
১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার (পূর্বোক্ত)
১১. চট্টোপাধ্যায়, নীলাঞ্জন, ‘দ্বৈরথ’ : অভূতপূর্ব এপিক উপন্যাস, আরাট্রিক (বিষয় : তপন বন্দ্যোপাধ্যায়), জানুয়ারি ২০২৪, পৃ. ৮২
১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরেন, ‘একুশ শতকের কথাসাহিত্য : সময়ের স্বর ও সংকট’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে প্রদত্ত মুখ্য আলোচকের ভাষণ, বাংলা বিভাগ, মানিকচক কলেজ, মালদহ, ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৩

### Bibliography:

- ‘আদ্রিয়ান ফন ডিস’, উইকিপিডিয়ার: মুক্ত বিশ্বকোষ, উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশন, -  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Adriaan\\_van\\_Dis](https://en.wikipedia.org/wiki/Adriaan_van_Dis)। সংগৃহীত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।
- টলস্টয়, লিও, আত্মা কারেনিনা, সম্পাদনা : রুদ্র তপন, অখণ্ড সংস্করণ, ই-বাংলা লাইব্রেরি, -  
<https://www.ebanglalibrary.com/books/%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%93->

---

[%E0%A6%A4%E0%A6%B2%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4/?hl=bn-IN](https://www.ebanglalibrary.com/books/%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%8F/) সংগৃহীত ২৭ ফেব্রুয়ারি

২০২৬।

‘টলস্টয় লিও’, ওয়ার অ্যান্ড পিস, সম্পাদনা : রুদ্র তপন, অখণ্ড সংস্করণ, ই-বাংলা লাইব্রেরি, -

[https://www.ebanglalibrary.com/books/%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B8-](https://www.ebanglalibrary.com/books/%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%8F/)

[%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%8F/](https://www.ebanglalibrary.com/books/%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%8F/) সংগৃহীত ২৭ ফেব্রুয়ারি

২০২৬।

টলস্টয়, লেভ, চাইল্ডহুড, অ্যাডোলসেন্স, ইউথ, ইংরেজি অনুবাদ, রাদুগা পাবলিশার্স, ১৯৮৮।

দত্ত, প্রশান্ত, সম্পাদক, তপন বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, আমার বর্ণমালা, জানুয়ারি ২০২৬।

‘ভি. এস. নাইপল’, উইকিপিডিয়া : মুক্ত বিশ্বকোষ, উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশন, -

[https://en.wikipedia.org/wiki/V.\\_S.\\_Naipaul](https://en.wikipedia.org/wiki/V._S._Naipaul), সংগৃহীত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।